৭৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 27 JUL 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

'ফুয়েল' না দিলে শিক্ষা ভবনের ফাইল নড়ে না

শরিফুজ্জামান পিন্টু

শিক্ষা ভবনের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে দেশের শিক্ষক সমাজ। এ ভবনে 'ফুয়েল' ছাড়া ফাইল নড়ে না এক চুলও। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার অনুদানের চিঠি, বদলি আদেশ, এমপিওভুক্তি বা পদোন্নতিপত্র সব কিছুর জন্যই দিতে হয় নির্ধারিত অঙ্কের অর্থ। দুষ্ট লোকেরা বলে থাকেন, এ ভবনের চেয়ার-টেবিল পর্যন্ত টাকার জন্য হা করে থাকে। শিক্ষা ভবনের বিভিন্ন শাখায় সরেজমিন পরিদর্শনকালে এসব কথার সত্যতা মিলেছে। শিক্ষকদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে এন্তার অভিযোগ।

জাতির বিবেক হিসাবে পরিচিত শিক্ষকরা শিক্ষা ভবনে এসে এভাবে বিবেকবর্জিত কাজ মোকাবিলা করছেন দিনের পর দিন। তাঁদের কাছে শিক্ষা ভবন এক আতঙ্কের নাম, তবু

(১৫ পাতায় ৩-এর কলামে দেখুন।

'ফুয়েল' না দিলে

(প্রথম পাতার পর)

প্রতিবছর প্রত্যেক শিক্ষককে এক বা একাধিকবার এ ভবনে আসতে হয়। এখানে এসে নিজ হাতে ঘুষের অর্থ প্রদান ও ছাত্রদের নীতি-নৈতিকতা শিখানোর মতো স্ববিরোধী কাজে লিপ্ত হন তাঁরা।

শিক্ষা ভবনে গড়ে উঠেছে একাধিক দুর্নীতিবাজ চক্র। এখানে ঘুষ লেনদেনের বিষয়টি ওপেন সিক্রেট। শিক্ষকদের যে কোন কাজের জন্য শিক্ষা ভবনে ঘুষ দিতে হয়। এটিই এখানকার স্বাভাবিক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এ রেওয়াজ চলে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। সব সরকারের আমলে ঘুষ লেনদেন ছিল। অবস্থা দেখে ও শুনে মনে হলো, এ প্রথা অদূর ভবিষ্যতেও থাকবে। কারণ যেসব সংঘবদ্ধ চক্র সূক্ষ্মভাবে প্রথাটি গড়ে তুলেছে তারা অঘোষিত চ্যালেঞ্জ দিয়েই শিক্ষা ভবনে টিকে আছে। তাদের স্থানচ্যুত করার কেউ নেই। যে অর্থের জন্য দুর্নীতিবাজরা একই জায়গায় ৮/১০ বছর শিকড় গেড়ে বসে আছে সেই অর্থই তাদের বদলি ঠেকিয়ে দেয়। সরকার, মন্ত্রী ও সচিব আসেন ও যান। কিন্তু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা স্থানচ্যুত হয় না। তাদের শিকড় গভীরে প্রোথিত। তা উপড়ে ফেলার যেন কেউ নেই।

অনুসন্ধানে জানা যায়, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিদিন যত শিক্ষক শিক্ষা ভবনে আসেন, এত বেশি সংখ্যক লোকের সমাগম রাজধানীর অন্য কোন অফিসে হয় না। শিক্ষকদের বেশিরভাগ কাজ শিক্ষা ভবনে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এখানে কাজের চাপ বেশি। তাই ফাইল চালাচালি নিত্যদিনের দৃশ্য। এ সুযোগের পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করে দুর্নীতিবাজরা। রাজধানীতে ঘুষ লেনদেন হয় এমন চিহ্নিত অফিসসমূহের মধ্যে শিক্ষা ভবনের স্থান এখন টপ-লেভেলে। তবে এখানে মুষ্টিমেয় কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন যাঁরা নীতি-নৈতিকতা মেনে চলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ঘুষখোরদের দোর্দণ্ড প্রতাপে তাঁরা কোণঠাসা।

শিক্ষা ভবনে ঘুষের অর্থ অনেকটা নির্ধারিত। একেক ধরনের কাজের জন্য একেক রেট। সর্বোচ্চ ঘুষের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা, সর্বনিম্ন ২০ টাকা। এমপিও তালিকাভুক্তির জন্য কাগজপত্র ঠিক থাকলে এক হাজার টাকা। ভুয়া তথ্য দিয়ে এমপিওভুক্ত হতে চাইলে দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা। টাইম স্কেল পাবার জন্য এক হাজার টাকা। ভুয়া অভিজ্ঞতা দেখিয়ে টাইম স্কেল পেতে চাইলে দুই থেকে তিন হাজার টাকা। বিএড পাসের পর স্কেল পরিবর্তন কার্যকর করতে চাইলে ন্যূনতম পাঁচ শ' টাকা। নতুন শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাবার পর প্রথম বেতন ছাড় করাতে এক হাজার টাকা। এসব টাকা সাধারণত দুর্নীতিবাজ কেরানী হাতে নেয়। তার মাধ্যমে ভাগ পায় কর্মকর্তারা। উল্লেখ্য, শিক্ষা ভবনের অধিকাংশ কর্মকর্তাই শিক্ষক। একজন শিক্ষক হয়ে আরেকজন শিক্ষকের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে ঘুষ নেয়ার বিষয়টি নীতিবান শিক্ষকদের আহত করে প্রতিনিয়ত।

এদিকে এক শ্রেণীর পিওন-দারোয়ান কিন্তু চুপ করে বসে নেই। তারা দরজার গেট আটকিয়ে, ফটোকপি বা টাইপ করে অবৈধ অর্থ উপার্জন করছে। তাদের আয় কুড়ি থেকে এক শ' টাকায় সীমাবদ্ধ। গেটের কাছে যেতেই তারা নানা প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করে আগন্তুক শিক্ষককে। কর্মকর্তা ব্যস্ত থাকুক আর নাই থাকুক পিওন-দারোয়ান জানিয়ে দেয় 'স্যার বিজি আছেন।' এভাবে কথোপকথনের এক পর্যায়ে তাদের হাতে কিছু গুঁজে দিলেই দরজা খুলে যায়। এর পর ভিতরে ঢুকলে দেখা যায় কাঙ্ক্ষিত ফাইলটি টেবিলে পড়ে আছে। ফুয়েল দিলে ওটা নড়াচড়া করে খুব দ্রুত। নচেৎ ফাইলের স্তূপে ঢাকা পড়ে যায়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসে ঘোরাঘুরির পর বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত শিক্ষক বাধ্য হন টাকা দিয়ে ফাইল ছাড়াতে। পিওন বা দারোয়ান যখন পয়সা নেয় বা চায় তখন ওটাকে বলা হয় 'চা-নাস্তা' বাবদ। আর কেরানী বা কর্মকর্তা যখন পয়সা নেয় তখন সেটাকে বলা হয় 'মিষ্টি খাওয়া' বাবদ।

মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো শিক্ষা ভবনের একদিকে রয়েছে ঘুষ ও অপরদিকে রয়েছে দুর্ভোগ। ঘুষ না দিলে চরম দুর্ভোগ পোহাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। তাই অভিজ্ঞ শিক্ষকরা ফাইল উপস্থাপনের সময় দুর্ভোগ এড়াতে লেনদেনের বিষয়টি শেষ করেন। দূর-দূরান্ত থেকে সারারাত ভ্রমণ করে এসে দুর্ভোগ পোহাবার চেয়ে টাকা দিয়ে কাজ সেরে রাজধানী ত্যাগ করাকে তারা শ্রেয় মনে করেন।

এদিকে শিক্ষা ভবনে গত এক সপ্তাহ সরেজমিন পরিদর্শনকালে এ প্রতিবেদকের সাথে অন্তত ডজনখানেক ভুক্তভোগী শিক্ষক ও একজন নামকরা শিক্ষক নেতার সাথে কথা হয়েছে। তাঁরা কেউই নাম-ঠিকানা প্রকাশ করতে চান না। তাঁদের ধারণা, নাম-ঠিকানা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে আবারও দুর্ভোগ পোহাতে হতে পারে।

শিক্ষা ভবনে এসে ছয়দিন একটি সামান্য কাজ নিয়ে ঘুরছেন একজন মাদ্রাসা অধ্যক্ষ। তিনি বয়সে প্রবীণ, ধর্মীয় লেবাস। মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটিতে একজন বিদ্যানুরাগী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে তার অনুমোদন নিতে তিনি শিক্ষা ভবনে এসেছেন।

গত শনিবার ঢাকা এসে রবিবার ফাইল পুটআপ করেছেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ফাইলটি ছাড় হয়নি। এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যক্ষ জানালেন, এখানে পয়সা লাগে জানি। কিন্তু আমি দেব না।

রাজশাহী থেকে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষা ভবনে এসেছিলেন প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি জানতে। এ ব্যাপারে অফিসারের সাথে দেখা করতে চাইলে পিওন হাতিয়ে নেয় ২০ টাকা।

সাতক্ষীরার আশাশুনি থানার একজন হাইস্কুল শিক্ষক এসেছেন স্কেল পরিবর্তন করার জন্য। তিনি জানালেন, মিষ্টি খেতে কেরানীকে শ' পাঁচেক টাকা না দিলে কাজই হবে না।

পিরোজপুরের গরঘাটা থেকে আসা এক শিক্ষক জানালেন, '৯৬ সালের জুলাই মাসে কৃষি শিক্ষক হিসাবে যোগ দিই। চাকরির বয়স এক বছর হলেও একটি টাকাও আমার নামে যায়নি।

নতুন শিক্ষক হিসাবে যোগ দেয়ার পর বেতন-ভাতা ছাড় করাতে এসেছিলেন রংপুর থেকে একজন কলেজ শিক্ষক। তিনি জানালেন, এক হাজার টাকা দিয়েছি, তবু সময়মতো কাজ হচ্ছে না।

শিক্ষা ভবনে সরেজমিন পরিদর্শনকালে কথা হলো এক শিক্ষক নেতার সাথে। তিনি জানালেন, অন্তত দশজন শিক্ষকের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি শিক্ষা ভবনে এসেছেন। তিনি এ প্রতিবেদককে প্রশ্নের সুরে বললেন, আমি যদি ঐসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কথা বলি তাহলে ওরা কি আমাকে আদৌ পাত্তা দেবে?